শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-সংখ্যা

১ম বর্ষ	শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ ঃ ১৬ই পদ্মনাভ ঃ ৩০শে আশ্বিন ঃ ১৭ই অক্টোবর ঃ সোমবার ঃ গৌরাব্দ ৪৬৯ ঃ বঙ্গাব্দ ১৩৬২ ঃ ইং ১৯৫৫ ।	৩য় সংখ্যা

—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—

গৌরাঙ্গৈকগতিং গদাধরমতিং স্বানন্দকুঞ্জস্থিতিং
গোবিন্দৈকপতিং ব্রজাশ্রিতরতিং রাধাঙ্ঘ্রি সেবাকৃতিম্ ।
সচ্ছাস্ত্রৈকনতিং কুসঙ্গবিরতিং দুঃস্থ-ব্যথানিষ্কৃতিং
বন্দে ভক্তিবিনোদমাগমতিথিঞ্চাস্য প্রজাশংকৃতিম্ ॥

—শ্রীল শ্রীধর গোস্বামি-পাদ ।

"ঠাকুর অপ্রাকৃত মহাকবি শ্রীরূপের অভিন্ন কলেবর ছিলেন। প্রাকৃত-কবি দ্রষ্টা বা ভোক্তার অভিমানে মায়ার বিলাস-দর্শনে মুগ্ধ, কিন্তু আমাদের ঠাকুর স্বরূপশক্তিবিলাসী শক্তিমান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবায় মুগ্ধ। প্রাকৃত-কবি প্রকৃতি-সম্বন্ধি বিরাট্ বা বিশ্বরূপে লোলুপ, কিন্তু আমাদের ঠাকুর প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে সপ্রণয়বিকৃতি শ্রীনন্দ-নন্দনের রূপ-সেবার মূর্ত্তবিগ্রহ। "হরিভজন কর, করাও"—ইহাই ছিল তাঁহার জিহ্বার ও লেখনীর ভাষা। বিষয়-কথা-কীর্ত্তনে তিনি সর্ব্বদাই তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিতেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

—শ্রীগৌড়ীয়-দর্শনাচার্য্য ভাস্কর-শ্রীল জীব-প্রভুর প্রণাম—

যঃ সাঙ্খ্য-পঙ্কেন কুতর্ক-পাংশুনা
বিবর্ত্ত-গর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্ ।
শুদ্ধং ব্যধাদ্বাক্-সুধয়া মহেশ্বরং
কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু মে গতিঃ ॥

—বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথিতে—

(শ্রীগোবিন্দ মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম)

শ্রীধাম নবদ্বীপ।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে। গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায়তে॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

আজ শ্রীমঠে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুপস্থিতিতে তাঁর ইচ্ছায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহিমা শংসন জন্য আপনাদের সম্মুখে আমি দণ্ডায়মান, আমার মত একজন পতিত অধম জড়ধীর কোন অধিকারই নাই—সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব ঠাকুর মহাশয়ের কথা কীর্ত্তন করিবার। কেন না—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর। বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥" শ্রীভগবান্ বা তাঁহার ভক্তগণ—পার্ষদগণ,—অধোক্ষজতত্ত্ব; তাঁহাদের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট সমস্তই অধোক্ষজ। অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে সেই তত্ত্ব জানা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। বেদাদি সর্ব্ব-শাস্ত্রেই স্পষ্টরূপে একথা কীর্ত্তিত আছে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন—" ইত্যাদি। অতএব আমার মত মূঢ় কিভাবে সেই তত্ত্বের পরিচয় দিতে পারে? তবুও আমি আজ আপনাদের ন্যায় মহান্ বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের সম্মুখে যে দণ্ডায়মান্ হয়েছি,—তাহা একমাত্র গুরু-পাদ-পদ্মের কৃপাদেশ বলেই। "বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ, শুনিয়াছি সাধু-গুরুমুখে।"—কিন্তু আমি অযোগ্য। তবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইলে বিষ্ঠাভোজী কাক ও ভগবদ্বাহন গরুড়ের পদবী লাভ করিতে পারে; পঙ্গুও পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের সামর্থ্য লাভ করিতে পারে; মহামূর্খও পাণ্ডিত্য-প্রতিভালোকে দশদিক উদ্ভাসিত করিতে পারে এমনকি মূক অর্থাৎ বাক্-শক্তিরহিত ব্যক্তিও সরস্বতীর ন্যায় বক্তা হইতে পারে; অতএব আমি সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সেবামুখে তাঁহার করুণা-শক্তি প্রার্থনা করি।

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাতেই তাহার কৃপা-শক্তি বিগ্রহ ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ, আজ হ'তে প্রায় ১১৭ কি ১১৮ বৎসর পূর্ব্বে গৌর-ধামের অন্তর্গত নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামে আবির্ভূত হন।

ভগবান্ বা তদীয়গণের আবির্ভাব-কালের লক্ষণ, শাস্ত্রে এই প্রকার দেখা যায় যে,—যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সেই সেই কালে সাধুগণের পরিত্রাণ বা পালন, দুষ্কৃতগণের বিনাশ বা দমন এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ বা তাঁর পার্ষদ বা তাঁর ভক্তগণ জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কিছু পরে, ঠিক অনুরূপ অবস্থা জীব-জগৎকে অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছিল; সর্ব্ব-শাস্ত্র-তাৎপর্য্যসার সুবিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম কাল-প্রভাবে ক্রমশঃ আত্মগোপন করিতে থাকিলেন এবং তৎস্থানে মায়া-পিশাচীর নব-নব বিলাস-ধর্ম্ম, জীবগণকে মহাধ্বান্তপূর্ণ ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতে থাকিল; ফলে ধর্ম্ম, চর্ম্মগত-বিচারময় হইয়া পড়িল! অজ্ঞতাই সাধুতার আসন গ্রহণ করিল; যোগাদি, ভোগাভিসন্ধিমূলক হইয়া পড়িল; জ্ঞানানুশীলন, শূন্যগতিতে পর্য্যবসিত; জপাদি যশোলাভের জন্য, তপস্যাদি পরহিংসার জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল; দানাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ এবং অনুরাগময় ভগবদ্ভজনের নামে ঘোরতর ব্যভিচার, বুদ্ধিমানগণেরও বুদ্ধিভেদ ঘটাইতেছিল। সাধুগণ—কালের প্রবল-প্রভাব দর্শন করিয়া, ও নিজেদের ভজন-জীবনের অত্যন্ত বিপদ-শঙ্কুল অবস্থা সমাগত দেখিয়া—ভীত হইয়া পড়িলেন এবং জীব-মঙ্গলের জন্য আকুল প্রাণে ভগবচ্চরণে

যখন সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন,—ঠিক সেই সময় ভুবনমঙ্গল অবতার নদীয়া-বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপা-শক্তি-বিগ্রহ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ প্রভুর মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিতে নদীয়ার পূর্ব্বশৈল উদ্ভাসিত করিয়া বিমলানন্দ-জনকরূপে সাধুগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ বা তাঁহার পার্ষদগণের জন্মাদি লীলা প্রাকৃতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও তাহা অপ্রাকৃত—একথা আপনারা বহুবার শুনিয়াছেন ; কর্ম্ম-ফলবাধ্য জীব স্বকৃত-কর্ম্মফল-ভোগের জন্য এই জগতে জন্ম-গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্তু ভগবান্ বা তদীয়গণ, কৃপা পরবশ হইয়া অচিৎ জগৎ হইতে—এই বিপদ-শঙ্কুল সংসার হইতে জীবগণকে চিন্ময়ানন্দময় জগতে লইবার জন্য—ভগবৎ সেবানন্দরূপ স্বরূপ-সম্পদ দান করিবার জন্য স্বেচ্ছায় জন্মলীলা পরিগ্রহ করেন। একটি—পরতন্ত্রতা বশতঃ ; অপরটী—স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। আংশিক দৃষ্টান্ত-স্বরূপ,—কারাগারে কয়েদীগণ ও কয়েদীগণের মঙ্গলবিধানকারী শিক্ষকগণকে ধরা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাঁরা যে কোন কুলেই জন্মগ্রহণ করুন্ না কেন—কুলের সঙ্গেও তাঁদের কোন সম্পর্ক থাকে না। হনুমান্—কপিকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; ভগবদ্বাহন গরুড়দেব—পক্ষীকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের পূজাই করিয়া থাকে। এই জগতের শাস্ত্রীয় দৈব-বর্ণাশ্রম বিধিতেও দেখা যায় যে,—যে কোন কুলোৎপন্ন ব্যক্তিই তাহার গুণ-কর্ম্মাদি লক্ষণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সংজ্ঞায়—সংজ্ঞিত হইবে। জন্মের পরিচয়ে তাহাদের বর্ণ-নিরূপণ হইবে না। সুতরাং ভগবৎপার্ষদ যাঁরা—যাঁরা নিত্যমুক্ত, কুল-পরিচয়ে তাঁহাদের পরিচয় কিরূপে সম্ভব হইবে ? এই জন্য জীব-শিক্ষক শ্রীল সনাতন গোস্বামী,—শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর বংশ পরিচয় বিষয়ে—"কায়স্থ-কুলাব্জ-ভাস্করঃ" এই পরিভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। পদ্মের সঙ্গে সূর্য্যের যতটুকু সম্পর্ক অর্থাৎ পদ্ম—জল জাত কোমল পুষ্প এবং সূর্য্য জগৎ-প্রকাশক, জলন্ত অগ্নি-পিণ্ডস্বরূপ ; এই দুইএর কুলগত বা পদার্থ গত কোন সাম্য বা সাদৃশ্য নাই। তথাপি সূর্য্য স্বীয় কর-বিতরণের দ্বারা পদ্মকে প্রস্ফুটিত ও প্রফুল্লিত করিয়া যেটুকু সম্পর্ক অঙ্গীকার করেন, কুলের সঙ্গে বৈষ্ণবগণের সেইটুকু সম্পর্ক—এ দৃষ্টান্তও আংশিকভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে পার্ষদগণ বা বৈষ্ণবগণ যে কুলকে অঙ্গীকার করিয়া আবির্ভূত হন সেই কুলই পবিত্র হইয়া যায়—এবিষয়ে শাস্ত্রের এই শ্লোকটী প্রমাণরূপে আপনারা বিচার করিয়া দেখিবেন—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতি শ্চ ধন্যা।" 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' এই শ্রৌত ন্যায়ানুসারে বিচার করিলে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, ভক্তের আবির্ভাব তিথির মাহাত্ম্য শ্রীভগবদাবির্ভাব তিথি-মাহাত্ম্য অপেক্ষাও অধিক মঙ্গলদায়ক। যেহেতু ভক্তের জীবনচরিতে অতি সুষ্ঠুভাবে শ্রীভগবৎ-তত্ত্বানুশীলন শিক্ষার যতটা সুযোগ হয় সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরিত্রে ততদূর হয় না। সেইজন্যই শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব ভক্ত-তত্ত্বের আচ্ছাদনে শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে জগতে উদিত হইয়া ভক্তি-শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবে জগতের হাওয়া ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং ঠাকুরের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহ সজ্জনগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করে। প্রাকৃত পরিচয়ে,—বালক স্বল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে বিদ্যাধ্যয়নাদি কার্য্যে কালাতিবাহিত করেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা, মনোমুগ্ধকর চেষ্টা, অভূত পূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি এবং প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়া আত্মীয় বর্গ বিস্মিত হইয়া যান এবং বালকের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হইতে থাকেন। ধর্ম্মানুরাগ ঠাকুরের জীবনে এত প্রবলরূপ ধারণ করে যে, সেই অল্প বয়সেই সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে পণ্ডিতগণও মোহযুক্ত হইয়া পড়িতেন। সেই সময় হইতেই ঠাকুর মহাশয় বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করিতে থাকেন। আত্মীয়গণও বালকের কৈশোর-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত জীবের ন্যায় কর্ম্ম-লীলায় অবতীর্ণ হইয়া ঠাকুর মহাশয়, তৎকালে বঙ্গ-সন্তানগণের দুর্ল্লভ পদবী সমূহ গ্রহণ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে উড়িষ্যায় গমন করেন এবং সেখানে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থান করিতে থাকেন। তৎকালে তাঁহার ধর্ম্মালোচনার বিশেষ সুবিধা হয় এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীভক্তিমণ্ডপ স্থাপন করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে বহু ভক্তবৃন্দ, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরিশোভিত হইয়া জগৎ-জীবের ভব-বন্ধন-ছেদন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহ বিচার করিতেন। কৃষ্ণ-বিমুখ—বহির্ম্মুখ জীবের দুঃখে এতবেশী কাতর হইতেন যে, সময় সময়, আত্মভোলার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে—"হা গৌরাঙ্গ হা নিত্যানন্দ! তোমরা এই জগৎ-জীবের প্রতি একবার চাও প্রভো!" বলিয়া অজস্র রোদন করিতেন। সেই ভক্তিবিনোদ প্রভুর আকুল আহ্বানেই গৌর মহাপ্রভুর করুণার মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে একদিন জগদ্বাসী শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণ-ধূলি লাভ করিয়াছিল।

অত্যল্পকালের মধ্যেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারাদি আচার্য্য-লীলায় বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য সজ্জনগণও সেবকসূত্রে যোগদান করেন। শ্রীল ঠাকুরের প্রচারের পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বিমল-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, কতকগুলি অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের দ্বারা এরূপভাবে কলুষিত, বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল যে, লোকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলিতে—অত্যন্ত হেয়, ঘৃণ্য, নীচ-প্রকৃতি লোকের ধর্ম্ম এবং আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, সখীভেকি, নেড়া-নেড়ীর ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত ও উপহাস করিত; কিন্তু ভক্তিবিনোদের অভ্যুদয়ে ও চেষ্টায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্লানিমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বীয় বিমল-স্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্মের শীর্ষস্থানে 'জৈব-ধর্ম্ম'রূপে জগতের ধর্ম্মাকাশে নবোদিত প্রভাত-ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; সজ্জনগণ সকলেই জানিলেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মই একমাত্র নির্ম্মল-উজ্জ্বল-নির্ম্মৎসর-ভক্তি-বিনোদন কারী স্বরূপধর্ম্ম,—যার ভিতর নাই কোন কপটতা— আবিলতা— অবরতা এবং আরও জানিলেন—যদি সমস্ত ধর্ম্মও ব্যাষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয় তবে নিশ্চিত সেগুলি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপানরূপে শোভা পাইতে থাকিবে।

তথাকথিত চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর ভ্রান্ত-ধারণা নিরসন করিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মই যে, সর্ব্ব-ধর্ম্মের একমাত্র মহান্ চিৎসমন্বয় প্রদান করিতে পারে, একথা ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ভাষা-লেখনী ও সর্ব্ব-প্রকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের পরে জীব-জগৎকে তিনি যেভাবে হরিবিমুখতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে কোনদিনই কাহারও প্রতি মৎসরভাব পোষণ করিতে কেহই দেখে নাই, তবে নিরপেক্ষ-সত্যকথা কীর্ত্তনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাও তাঁহার ছিল না। ভক্তির নামে ছলধর্ম্ম; মিছাভক্তি বা অভক্তিপর বিচারের প্রশ্রয় কোনদিনই দেন নাই। তাঁহার লেখনী নির্ভীকভাবে তারস্বরে সত্যকথা ঘোষণা করিয়াছে। জাগতিক প্রতিষ্ঠাকে তিনি শূকরের বিষ্ঠার তুল্য মনে করিতেন। সেই সময় বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গৌরাঙ্গ-বিষয়ক নাটকের উদ্বোধনের জন্য শ্রীল ঠাকুরকে বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাহা সোজাসুজি পাঁচ-মিশালী ব্যাপার বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। উড়িষ্যার কোন এক মহাযোগী (?) যৎকালে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা পাহাড়ের চূড়া হইতে নিজেকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া নরকের পথে স্ব-দলবলে অগ্রসর হইতেছিল এবং সনাতন-ধর্ম্মের পথে কণ্টকরাশি প্রদান করিতেছিল, তখন তিনিই তাঁহাকে কঠোরভাবে দমন করিয়াছিলেন। ভারতের বিশেষ বিশেষ মলিনতীর্থ সমূহকে যখন নির্ম্মল করিবার জন্য তিনি অভিযান করেন তখন কত অধম, কত পাপী তাপী তাঁহার সুশীতল চরণ স্পর্শ লাভে নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল তাহার আর কত উদাহরণ দিব।

তাঁহার ভারত ভ্রমণে বহু বিরুদ্ধধর্ম্মের অবসান হইয়াছিল। এইসবের দ্বারা তাঁহার মহিমার দিগ্‌দর্শন করাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে ;—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অতি সংক্ষেপে (বিস্তৃত ত আছেই) দুই একটী পয়ারের মাধ্যমে ঠাকুর মহাশয়ের যে নিগূঢ় পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহার সুষ্ঠু পরিচয় পাইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের "অনুভাষ্য" শেষে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"তাঁহার করুণা কথা মাধব-ভজন-প্রথা
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁর সম অন্য কেহ ধরিয়া এ নর-দেহ
নাহি দিল কৃষ্ণ-প্রেম-ধনে॥
সেই প্রভু-শক্তি পাই এবে অনুভাষ্য গাই
ইহাতে আমার কিছু নাই।
যাবৎ জীবন রবে তাবৎ স্মরিব ভবে
নিত্যকাল সেই পদ চাই॥

* *

শ্রীগৌর-কৃপায় দুই মহিমা কি কব মুই
অপ্রাকৃত-পারিষদ্-কথা।
প্রকট হইয়া সেবে কৃষ্ণ-গৌরাভিন্ন-দেবে
অপ্রকাশ্য কথা যথা তথা॥"

এই পয়ার কয়টী শুনিলেই আমাদের মুখ বা কলম একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ; মনে হয় করিতেছি কি! শিব গড়িতে গিয়ে বাঁদর গড়িয়া ফেলিতেছি! ঠাকুরের মহিমা গাহিবার মত শক্তি আমাদের কোথায়?—কোথায় সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের অমল-চরিত, আর কোথায় আমি মহাপতিত নরাধম! —শুধু এইটুকু আশাবন্ধ যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর অনুসম্বন্ধও জীবের সর্ব্বোত্তম কল্যাণ প্রদানে সমর্থ। বস্তুতঃপক্ষে ঠাকুরের করুণা সহস্রমুখে সহস্রধারায় প্রবাহিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিয়াছে।

ক্রমশঃ

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথিতে—

(শ্রীগোবিন্দ মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম)

শ্রীধাম নবদ্বীপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এমন কোন পদার্থ, এমন কোন ভাব, এমন কোন বিষয়ই ছিল না, যাহাকে শ্রীল ঠাকুর কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিযুক্ত না করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার প্রধান দুইটি ধারার মধ্যে যেন ভাগীরথী ধারায় (স্বয়ং আচার ও প্রচার) সমগ্র জগৎকে পূত করিয়া কৃষ্ণসেবার উপকরণ করিয়াছেন; আর সরস্বতী ধারায় বেদব্যাসের ন্যায় বেদাদি শাস্ত্রসমূহ মন্থন করিয়া আরও সহজ এবং সরলভাবে সর্ব্বত্র মুক্ত হস্তে কৃষ্ণপ্রেম-নবনীত বিলাইয়া দিয়াছেন। জগতে শ্রীল ভক্তিবিনোদের এই অতুলনীয় দানের কোন উপমা নাই—কোন বিনিময় নাই। গ্রন্থ জগতেও ঠাকুরের অপূর্ব্ব মহিমা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। তাঁহার রচিত "কি সূত্র-গ্রন্থ; কি সংহিতা গ্রন্থ; কি গীতি-গ্রন্থ; কি ভাষা-গ্রন্থ; কি লীলা গ্রন্থ; কি রস-বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ; কি সমালোচনা-গ্রন্থ; কি টীকা-টিপ্পনী, কি ভাষ্য-রচনা; কি তত্ত্ব-সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থ; কি কাব্য-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন" প্রভৃতির আলোচনার গ্রন্থসমূহ; তাঁহার প্রকাশিত অপ্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থ-রত্নাবলীই আজ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর সুস্নিগ্ধ সেবাময় আলোকে আরও অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া জগতের জীবকল্যাণ বিষয়ে মহাবদান্য অবতারীর অমন্দোদয়া-দয়ার আধারস্বরূপে তদভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে অতএব আর ২।১টী কথা বলিয়াই আমি বিদায় লইব।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধাম-সেবায় যিনি নিজের চেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই ভক্তিবিনোদপ্রভুর ধাম-প্রকাশের কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। বহু অপস্বার্থপর ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার বিষয়ে তাঁহাকে বহুপ্রকারে বাধা দিয়াছিল—কিন্তু তিনি অচল-অটলভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট যে শ্রীধামের প্রকাশ, তাহা এরূপ সুষ্ঠুভাবে করিয়া গিয়াছেন যে আজ সমস্ত অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের কলুষিত জিহ্বার কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন আর মায়াপুরকে চাপা দিবার কোন উপায়ই তাহারা খুঁজিয়া পায় না। এখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে মায়াপুরের গুণগান করিয়া থাকে। এককথায় বলিতে গেলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ছিলেন একাধারে—শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-রায়রামানন্দ—হরিদাস-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম প্রভুগণের মিলিতস্বরূপ। কেন না গোস্বামিবর্গের সমস্ত চেষ্টার পরাকাষ্ঠা তাঁহাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান দেখা যায়। কি ধাম প্রকাশ কার্য্যে; কি লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার বিষয়ে; কি অপ্রাকৃত গ্রন্থাদি-রচনায়; কি ভক্তি-সিদ্ধান্তে; কি বৈরাগ্যে; কি দার্শনিক বিচারে; কি হরিকথা কীর্ত্তনে; কি হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা জীবোদ্ধারলীলায়; সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার অপ্রাকৃত সামর্থ্যের মহিমা যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়াছেন।

আজ্‌কের এই তিথিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি প্রকটিত হইয়াছিলেন। অতএব এই তিথিও পরম পূজনীয়া, বরণীয়া এবং করুণাময়ী। আমার এমন কোন উপায়ই নাই যাহার দ্বারা আমি এই তিথি-বরার পূজা করি। আপনারা মহান্— পরম বৈষ্ণব; আপনারা কৃপা পূর্ব্বক এই তিথিবরার পূজা করিবার যোগ্যতা আমাকে প্রদান করুন; আর আপনাদের কৃপায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর কৃপা প্রার্থনার মহান্ আর্ত্তি জাগরিত হইয়া আমার অন্তর্বহিঃ শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তনের দ্বারা গৌরব মণ্ডিত হউক এবং নিত্যকাল শ্রীবিনোদ-সারস্বতগণের সেবায় নিযুক্ত করুক্— এই প্রার্থনা—। "বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ"।